নারীর কবিতা, দ্রোহের কবিতা—এই সময়

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখের মধ্যে বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমকালীন সমাজ আজ ভীষণভাবে আক্রান্ত। এই আক্রমণ শুধুমাত্র নারীর বিরুদ্ধে নয়, এই আক্রমণ শুধুমাত্র পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। ব্যক্তির সাথে গোষ্ঠীর, এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের, পিতার সাথে পুত্রের, স্বামীর সাথে স্ত্রীর। মার্ক্সের মতে—শ্রেণি বিভক্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। কর্পোরেট পুঁজিবাদ এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বা এলিয়েশনের থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কীভাবে নির্মিত হবে আজকের প্রতিবাদের কবিতা? কবিতার অভিমুখিনতা কি সত্যিই দ্রোহ সন্ধানী হয়ে উঠতে পারছে? নারীদের ভাবনায় (যদিও নারী, পুরুষ এই বিচ্ছিন্নতার ভাবনা থেকে দূরে সরে) তা কতদূর বিকশিত? ঠিক এই জায়গা থেকেই শুরু হতে পারত এই লেখার উৎসমুখ। আসলে একজন নারী বা একজন পুরুষের বিদ্রোহের কবিতা লেখার, প্রতিবাদের অক্ষর সন্ধানী হয়ে ওঠার প্রেক্ষিত কিন্তু সামাজিক পটভূমিকার মধ্যে আবর্তিত। যে সমাজে নারী বসবাস করেন ঠিক একই অবস্থান থেকে পুরুষও তার অক্সিজেন নেয়। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সমকালীন সংকটের ভেতর কীভাবে চারিত হচ্ছে প্রতিবাদের শেকড় তার অনুসন্ধান খুব জরুরি। নারীর প্রতিবাদ বলতে আমরা খুব সাদা চোখে যা বুঝি তা হোল-- পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চারিত দ্রোহ।

মহিলা কবি এই অভিধায় চিহ্নিত আলাদা কোন শব্দে আমি বিশ্বাস করি না। কারন কবিতার কোন মহিলা বা পুরুষ হয় না। এবং লেখার মধ্যে ভাষা বা উচ্চারণ থেকে তা শনাক্ত করাও কোন মুগ্ধ পাঠকের কাজ নয়। মহিলা এবং পুরুষ এই ধারণাও কিন্তু সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকেই প্রসারিত করে। এবং সম্মিলিত প্রতিবাদের মূল স্তম্ভটিকে আলগা করে দেয়। সামাজিক ভাবে প্রত্যেক মানুষের যেমন একটি পরিচয় থাকে, লিঙ্গগত ভাবেও। এতে ভাবনার কোন বদল বা হেরফের হয় না। এই বিষয়টিকে মাথার মধ্যে রেখেও এক আধিপত্যবাদের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যদি ফিরে তাকাই পিছনের দিকে। কী দেখব তাহলে? দেখব যে মানবজাতির প্রারম্ভিক লগ্নে মানুষ ছিল নির্বাক। কথা বলতে পারত না। ইঙ্গিত আর ইশারার মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হত সেদিন। মানুষকে প্রথম কথা বলতে অনুপ্রাণিত করেছিল তার যৌন চাহিদা। এবং সেই প্রথম শব্দময় ভাষাটি উৎসারিত হয়েছিল এক আদিম মানবীর কণ্ঠে। মানুষের শরীরে কোন যৌনগন্ধী ফেরোমন নেই। আর এই না থাকার কারনেই নিওলিথিক, প্যালিওলিথিক সেই যুগে নারীই প্রথম শিখতে বাধ্য হয়েছিল যৌনচাহিদার এক নিজস্ব স্বর সংকেত। শুধু তাই নয় মাতৃতান্ত্রিক সেই সময়ে

সন্তানকে বিপদ আপদ থেকে সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেওয়ার কারনেই তাঁর গলার আওয়াজ ক্রমিক ধারালো হয়ে ওঠে। এই কারনেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে নারীর শব্দের তীব্রতা পুরুষকণ্ঠের চেয়ে অনেকগুন বৈশি তীক্ষ্ণ এবং শাণিত। এ তো সেই সময়ের কথা যখন ইতিহাস প্রসাবিত হয়নি। কিন্তু সেই বহমানতা থেকে গেছে কণ্ঠে এবং প্রতিধ্বনির ভেতরে। এই ধারাাটিই ক্রমপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে আত্মজৈবিক উন্মোচনের নারীর এক নিজস্ব জগতের প্রতিবাদের স্রোত খুঁজে পেল। বিষয়টিকে যদি এভাবে যদি তাহলে নারীর স্বর, নারীর কবিতা বলে আলাদা একটা কিছু হয়। এই গদ্যে সেই স্বরটিকে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে এই সময়ের প্রেক্ষিতে।

এই সময় অর্থাৎ নব্বই ও পরবর্তী সময়ের নারীর দ্রোহের কবিতা, যা গদ্যের আলোচনার বিষয়। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে অল্পকথায় বলে নেওয়া যাক নারীর প্রতিবাদের ধারাটির কথা। সংসার প্রতিপালন করতে করতে শিশুকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য কাজের অবসরেও যারা সেদিন কলম তুলে নিয়েছিলেন কিছু লেখার জন্য সেই অন্নদাসুন্দরী দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী বা কামিনী রায়ের মত শ্রদ্ধাভাজন কবিরাই কিন্তু প্রথম প্রতিবাদী কবি। তাদের বিদ্রোহ অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, কিন্তু তারা যে রাস্তা নির্মান করেছেন পথ দেখিয়েছেন সেই পথ ধরেই এগিয়ে এসেছেন পরবর্তী সময়ের কবিরা।

১৯২০-৩০ এর দশকে স্বর্ণকুমারী দেবী, রাধারানী দেবীর কণ্ঠে নারীর প্রতিবাদী সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ আমরা প্রথম লক্ষ্য করলাম। এই প্রতিবাদ মৃদু ও মননশীল। যা ক্রমে পরিশীলিত মাত্রা লাভ করল পঞ্চাশের দশকে এসে- অর্ধেক মানবী আমি অর্ধেক যন্ত্রনা। ১৯৬০ এ এসে কবিতা সিংহ তাকে আধুনিক মাত্রা দিলেন—আমিই প্রথম ভেঙেছিলাম/হয়নি তোমার হাতের সুতোয়/ নাচের পুতুল/ যেমন ছিল অধম আদম/ আমিই প্রথম বিদ্রোহিনী/ তোমার ধরায়/ আমিই প্রথম/আমিই প্রথম ব্রাত্য নারী /স্বর্গচ্যুত/ নির্বাসিত/ জেনেছিলাম/স্বর্গেতর/ স্বর্গেতর/মানবজীবন/জেনেছিলাম/আমিই প্রথম। সমসাময়িকি কবি নবনীতা দেবসেন, গীতা চট্টোপাধ্যায় শুধু নারীবাদের কথাই লেখেননি, মানবিক সম্পর্কের অন্তসারশূন্যতার বিরুদ্ধেও লিখেছেন। বিজয়া মুখোপাধ্যায় বললেন—পৃথিবীতে যত খাদ্য চাই তার সুষম বন্টন। পরবর্তীতে সাধনা মুখোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, অঞ্জলি দাশ, কেতকী কুশারী ডাইসন,. কৃষ্ণা বসু, রমা ঘোষ নিজস্ব প্রকরণে তৈরি করে নিলেন বিদ্রোহের নতুন ভাষ্যরূপ। এর মধ্যে কৃষ্ণাদির উচ্চারণ এক বলিষ্ঠ পরিসর নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। ৮০ এর দশকে মল্লিকা সেনগুপ্ত, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা লাহিড়ী, বীথি চট্টোপাধ্যায়, রূপা দাশগুপ্ত, অনিতা অগ্নিহোত্রী, সুতপা সেনগুপ্ত, ঈশিতা ভাদুড়ি, মন্দার মুখোপাধ্যায়, অনুরাধ মহাপাত্র, মনিদীপা নন্দী বিশ্বাস এই প্রবাহের মধ্যে প্লাবন যোগ করতে পেরেছেন। এদের মধ্যে মল্লিকাদির কবিতার কণ্ঠ একটু উচ্চ ডেসিবেলের। তাঁর কবিতায় অনেকে স্লোগান ধর্মিতা লক্ষ্য করলেও ব্যক্তিগতভাবে এই গদ্যকারের মনে হয়েছে তাঁর কবিতা প্রতিবাদের এই জ্বলন্ত মশাল।

এই কথাগুলি বলা খুব জরুরি যে কৃষিভিত্তিক বাংলায় সামন্ততন্ত্রের থাবায় মহিলাদের উপর অত্যাচার তীব্র আকার নিয়েছিল। ইউরোপ বা আমেরিকার দাসপ্রথার চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠছিল ভারতীয় নারী জীবনের অস্থিরতা। সারা পৃথিবীতে নারীবাদের আন্দোলন যতই ছড়িয়ে পড়ছিল তারই সমান্তরালে বৃদ্ধি পাচ্ছিল নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের পরিসর। পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক এই ধারনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন হান্না মিচেল, সিমোন দ্য বোভয়ারের। গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে লড়াই এ নেমেছিলেন মেরি স্টোপস, ডোরা রাসেল। নারীর যৌন স্বাধীনতার দাবি জোরালো হয়ে ওঠে সিমোন দ্য বোভয়ারের চিন্তাচেতনায় এবং ধারাবাহিক কর্মসমারোহে। তারই অংশত প্রভাব এসে পড়েছিল বাংলা কবিতায়।

নব্বই এর দশকে এক ঝাঁক উজ্জ্বল প্রতিবাদী কবিকে আমরা পেলাম- রোশনারা মিশ্র, মউলি মিশ্র, সেবন্তী ঘোষ, যশোধরা রায়চৌধুরী, অনন্যা বন্দোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন, মিতুল দত্ত, বুবুন চট্টোপাধ্যায়, অহনা বিশ্বাস, সোনালি বেগম, নন্দিতা বন্দোপাধ্যায়, রিমি দে, বল্লরী সেন, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, তৃষ্ণা ভট্টাচার্য, গায়ত্রী গুপ্ত, সুদেষ্ণা দত্ত, রীনা কংসবণিক, পারিজাত মুন্সী, পৌলমী সেনগুপ্ত, রীনা গিরি, অনিন্দিতা গোস্বামী, দীপিকা বিশ্বাস, শিউলি রায়, শ্বেতা চক্রবর্তী, দীপশিখা পোদ্দার, শম্পা কুন্ডু, সৌমনা দাশগুপ্ত, পম্পা রায়, সুস্মেলী দত্ত, চৈতালি ধরিত্রী কন্যা, সুমনা সান্যাল, তিলোত্তমা মজুমদার, নয়নতারা তন্তুবায়, মৌ দাশগুপ্ত, বিজলী সাহা, শুভশ্রী রায়, অর্পনা দেওঘরিয়া, মিঠু সেন।

নব্বই এর অগ্রগণ্য কবি যশোধরা। পণ্য সংহিতা (১৯৯৬), পিশাচিনী কাব্য (১৯৯৮) চিরন্তন কাব্যমালা (১৯৯৯), আবার প্রথম থেকে পড়ো (২০০১) থেকে কুরুক্ষেত্র অনলাইন (২০০৮) এবং আজও তিনি মেয়েদের প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন-নারীরা অনেককিছু পারে যা পুরুষ পারে না। তিনি বারবার চেয়েছেন ভাবনার বিস্তার—আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষায়/আমাদের উদ্বেগ, শঙ্কায়/ঢুকে পড়লে, ন্যানো/আর তুমি জিজ্ঞেস করো না/আমাদের স্বপ্ন ও ধারনা। এত ছোট, এত ছোট ছোট / হয়ে আসছে কেন?

প্রতিবাদী কবি হিসেবে মন্দাক্রান্তা, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনিন্দিতা গুপ্ত রায়-এর নাম বিশেষভাবে লেখার মত। মন্দাক্রান্তা এবং অনিন্দিতার প্রথম পর্বের কবিতায় প্রতিবাদের সোচ্চারধ্বনি যা আমাদের চৈতন্যলোক আলোড়িত করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে অনিন্দিতা তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই নিজেকে ভাঙচুর করেছেন ক্রমাগত। সমাজ বদলের সাথে সাথে বদলেছে তাঁর কবিতার কার্ভেচার এবং প্রতিবাদের বাঁক। একই সময়ের কবি হলেও তাদের ভাবনা ও স্বরের ভিন্নতা নীচের উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

১. এখনও বিশ্বাস করব, এতবার আঘাতের পরও
একদিন নিশ্চিত তুমি আমাকেই বলবে রক্ষা করো। (মন্দাক্রান্তা)

২. তদন্ত চলছে
অভাবের তাড়নায় মা বিক্রি করে দিচ্ছে সন্তান

অভাবের তাড়নে বিষের প্রয়োগ, আত্মহনন
অভাবের তাড়ানায় প্রতিটি দেহকোষ অন্ন উন্মুখ (অনন্যা)

৩. পেটের আগুন দেহের আগুন মাথায় আগুন খুন
কুনজের মুখে আগুন-শাক পাতা তেল নুন
আনতে ফুরোয় পান্তাভাতের অম্ল ধোয়া জল
চোখের নাকি নদীর গাঢ় খুঁজতে ভূমি তল
নদীর মতই বইতে থাকি নাবিক চিনি না
ঘুমের ভিতর আকাশ খুঁজি "মন খারাপের মা" (অনিন্দিতা)

পরবর্তী সময়ে শূন্য দশকে এসে আরও বিকশিত হয়ে উঠল এই ধারা। নিজস্ব স্বর ও প্রকরণ নিয়ে উঠে এলেন- বিদিশা সরকার, তনুশ্রী পাল, তপতী বাগচী, অদিতি বসুরায়, জয়শীলা গুহবাগচী, মধুছন্দা মিত্র ঘোষ, মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘমিত্রা হালদার, রত্নদীপা দে ঘোষ, মণিজিঞ্জির সান্যাল, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, বিতস্তা ঘোষাল, অর্থিতা মন্ডল, সাঁঝবাতি, প্রমিতা দেবযানী কর সিনহা, কাবেরী রায়চৌধুরী, দেবযানী বসু, আকাশলীনা, ঐত্রেয়ী সরকার, শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী, অনন্যা সিংহ, প্রমিতা ভৌমিক, দোলনচাঁপা চক্রবর্তী, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ণশী বকসী, সুদীপ্তাদত্ত, বেবী সাউ, ঊষশী কাজলি, রাকা দাশগুপ্ত, জুঁই সরকার, অনন্যা দেব, এষা ঘোষ, শকুন্তলা সান্যাল, মনোনীতা চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

জয়শীলা অত্যন্ত মৃদুভাষী কবি। তাই তাঁর কবিতায় প্রতিবাদের রীতিও অসম্ভব মৃদুতায়। 'দেবদারু অপেরা' এই কাব্যগ্রন্থে কবির দ্রোহের এক নিরুচ্চার ধ্বনি আমরা টের পাই। বিতস্তার গলাতে অন্য সুর তুমি সিরিয়াল দেখ,

দুই বউ তিন স্বামী
সতী সাধ্বী স্ত্রী
প্রেম? সে তো প্রাগৈতিহাসিক....
তুমি যৌনতার কথা বলো
না বললে প্লিজ কবিতা লিখো না
এসব ছাড়া কবিতা জাস্ট হয় না সোনা।

মোনালিসা এবং সঙ্ঘমিত্রার প্রতিবাদের কবিতাও নারীবাদের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, আবদ্ধ থাকেনি মণিজিঞ্জিরের কবিতাও। প্রতিবাদ অনন্য মাত্রা পেয়েছে এদের কবিতায়। নারীবাদের সীমারেখা পেরিয়ে তা সার্বিক হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিনতা থেকে পালাতে চেয়ে নয়, বরং সমস্যার মুখোমুখি হতে চেয়েছেন বারবার। তাই উৎসের নিবিড়তা থেকে উঠে আসে তাদের পরিশীলিত বোধ। মণিজিঞ্জিরের কবিতায় ফেমিনিজম এবং ইকোফেমিনিজম সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছে। পরিবেশের উপর পুরুষের এবং সবলের

আগ্রাসন। অমানবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বারবার ফিরে এসেছে তাঁরা মাটির কাছাকাছি কাব্যে-

জীবনের দশটা বছর কেটেছে
অন্ধ কুসংস্কার ভরা সেই গ্রামে
মেয়ে বলে জন্মাবার পর থেকে
তার দিকে সেভাবে ফিরে তাকায়নি তার জন্মদাতা। (অন্য পৃথিবী)।

শর্মিষ্ঠার প্রতিবাদী কণ্ঠটি ভীষণ অন্যরকম—

পাপকথা সাফ সাফ শোন
পাদ্রীর ভূমিকা মহান
তুমি আমি মন টন খুঁড়ে
চোখে চোখে ক্রমশ তাকাই (তারপর)

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বাইরে বাদ বাংলার কবিতায় নারীর প্রতিবাদী কবিতায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে যেসব নারীর কবিতায় দ্রোহের উজ্জ্বলতা পাঠককে ছুঁয়ে যায় এরা হলেন– ঈশিতা ভাদুড়ি, সোনালি বেগম, নীতা বিশ্বাস, মধুছন্দা মিত্র ঘোষ, রত্নদীপা দে ঘোষ, জয়া ঘটক, বর্ণশ্রী বকসী, স্বর্ণালী বিশ্বাস, অঞ্জলি দাশগুপ্ত, রীণা ভৌমিক, সুমিত্রা পাল।

মধুছন্দার কবিতা এক অন্য টিউনের। বিবাহবার্ষিকী এই কাব্যগ্রন্থে মুলত প্রেম ও দাম্পত্যের কবিতা থাকলেও তিনি তার অগণিত কবিতায় তথাকথিত নারীবাদের বাইরে এসে মানুষের ভ্রষ্টাচার এবং অশোভন উদ্যমের বিরুদ্ধে নিজস্ব সুর সংযোজিত করতে পেরেছেন—

তোমার দহন ক্ষতে
অযথাই স্পর্শ করে হাত
ইহজন্ম পরজন্ম বৃথাই নিয়তি
হয়তো বা প্রতিপক্ষ যুদ্ধের কৌশল
নারীজন্মের অন্তরে বুঝি এত ক্ষোভ
জমা ছিল (দ্রোহ)

জয়া ঘটকের কবিতার উচ্চারণে কোন ভণিতা নেই বরং বলা যেতো পারে তা হৃদয়ের সার্বিক উন্মোচন–

কানে তুলো দাও
গান্ধারীর মতো চোখ বাঁধো.....
তারপর চলো

যেভাবে চললে কোন প্রশ্ন উঠবে না। রত্নদীপার প্রতিবাদী সত্ত্বার স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করেছি তার মৃত্যুকে নিষিদ্ধ করো, আমি ঈশ্বর হতে চাই সহ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে, তবে কি আগুন আঁকবো মোমবাতির ধুলো জাগরণে? এই আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই তিনি লিখতে থাকেন—

অই যে গৃহযুদ্ধ, ক্রমশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে যিশুখ্রিস্টের চুলদাড়ি
ক্রুশকাঠের চাবিতে খুলে যাচ্ছে দেবতাদের ব্যক্তিগত পিটুইটারি
আমরা জেনে যাচ্ছি তাদের সমস্ত কন্ডোমকাহিনি....

শূন্য পরবর্তী সময়ের কবিতার মধ্যে যাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ এখনও অবধি পাঠকের কাছে পৌঁছতে পেরেছে তাদের মধ্যে তুষ্টি ভট্টাচার্য, সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্কা, তানিয়া চক্রবর্তী, সুমনা কুন্ডু, একা সেনগুপ্ত, ঊষসী ভট্টাচার্য, তিয়াসা মজুমদার, দীপান্বিতা পাল, দেবাদৃতা বসু, পৃথা বারি, পৃথা রায় চৌধুরী, মৌমিতা মন্ডল, শ্রীপর্ণা দে, সুচেতা রায়, দীপা পান, শ্রাবন্তী মজুমদার, শাওলী দে, পিয়াল রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে চারজনের কথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলব এঁরা হলেন তুষ্টি ভট্টাচার্য, সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তানিয়া চক্রবর্তী এবং উল্কা। তুষ্টির কবিতা প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্ব কলেজজীবনে হলেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন 'ভিজে যাওয়া গাছ' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে তার কাব্যভাবনার সাথে পাঠক পরিচিত হতে পেরেছেন শুধু নয়, পাঠক তাঁকে সমাদরও করেছেন। তার কবিতা বয়ন বাস্তবের ঘেরাটোপ থেকে অর্জিত তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন—

ঈশ্বর এক রহস্যময় তুরুপের তাস
হোয়াইটনার দিয়ে মুছে দেব ঈশ্বরের নাম
নাম হারিয়ে রাস্তার কুকুরের মতো ঘুরবে তুমি
অলিতে গলিতে ঢিল মারবে ছেলের দল
তখন বুঝবে হে ঈশ্বর মজাটা কোথায়! (ঈশ্বরের নাম মুছে দেবে)

সংগীতা খুব সহজ কথায় উন্মোচন করতে পারেন হৃদয়জাত যাবতীয় অনুভব রাস্তা ভুল হওয়া শেষ বাঁকে এসে নতুন এক দিশার সন্ধান তাঁর কবিতায়। যা প্রেমে ও প্রতিবাদে উজ্জ্বল—

শরীর সাজিয়ে বসে আছি পসারিনী—
সকলেই স্বাগতম, প্রবেশ অবাধ
ভালোবাসা শুয়ে নিয়ে বাকিটুকু ফেলে দিতে জানি
এ শিক্ষা তোমার কাছে, তুমিই প্রাপক—
করুণা ও কৃতজ্ঞতা,
হে আমার প্রথম ধর্ষক। (অপযশ)

তানিয়া এসময়ের একজন অসম্ভব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি। কিছু একটার জন্য এবং পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া কাব্যগ্রন্থ দুটি সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। প্রচুর চর্চিত হয়ছে কবির কাব্যভাবনা এবং সারস্বত অক্ষরসাধনা। তঁর কবিতায় প্রতিবাদ একটু আধুনিক মননে ও মৃদুতায় অনুবর্তিত—

চামড়া চাকো ঈশ্বরী
অ্যাপল অফ প্যারাডাইস,
চামড়া ঢাকো ইতবাচক
যতই উপরে থাক ডিম্বাশয়—
এসব কোন যুক্তি নয়
উহা থাক
প্যালেস্টাইন
যতই নীচে থাক শুক্রাশয়—
এসব কোন যুক্তি মুক্তি নয়
উহা থাক
প্যালেস্টাইন
মিছিল ঘোরে, রেচন হলে ঘুমিয়ে পড়ে
ঘরকে বল- ঘরকে বলো মিছিল হতে
ইঁট খুঁড়লেই মাটি, মাটির তলায় জল। (আদেখলা শহরের মুদাহীন চাঁদ)

উল্কা গদ্য এবং পদ্যে ফর্ম এবং কনটেন্ট নিম্নে তীব্র নিরীক্ষায় বিশ্বাস করেন, তাঁর বিভিন্ন কবিতায় শ্লেষ এক অনবদ্য আকার নিয়েছে—

অন্ধকার জ্বেলে মোমবাতিদের মর্গে পাহারা লিখিয়ে নিয়েছে যারা
তাদের ঠোঁট ফাটতেই ঠোঁট ফুটতেই টিভি স্ক্রিনে ঠেকিয়ে নিলাম গরম চা
আজ নতুন করে সুন্দরবন গড়তে গিয়ে কারা বাঘের বদলে তুলে আনল রুমাল চোর
(প্রতি -ইতি)।

বাংলাদেশে যারা এই সময় দাপটের সাথে প্রতিবাদী কবিতা লিখছেন তাঁরা হলেন– কচি রেজা, মেঘ অদিতি, সাইদা মিমি, অপরাজিতা ফেরদৌস, তবসুম, জিনাত জাহান খান, নভেরা হোসেন, আমিনা শেলী, শেলী নাজ, অদিতি ফাল্গুনী, মুক্তা রহমান, নাশিদা খান চৌধুরী, সুবর্ণা গোস্বামী। এদের মধ্যে কচি রেজা এবং মেঘ অদিতি কোন ভুগোল সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। দুবাংলার মানুষের কাছেই তাঁদের স্বর আজ সুপরিচিত। প্রেমে প্রতিবাদে বিষাদে সার্বিক অনুভবে ব্যপ্ত তাদের কবিতার ভুবন।

মেঘ অদিতির কবিতায় আমরা দেখতে পাই–

একটি উড়ুক্কু ল্যান্ডস্কেপে,
থেকে থেকে রঙ ঝরে তোমার চিবুক ভাঁজে।

তপ্ত লাভার দিন, স্বগতোক্তি যত, ধীরে,
ক্ষীণ হয়ে আসে তার সমস্ত শরীর জুড়ে নেচে যায় বোধের তীব্র ছোবল
একটি প্রাচীন রাগ গোপনে বুনে যায় দীর্ঘশ্বাস।

কবি বদলাতে পারেনা এই অস্থির সময়ের আগ্রাসন। কবি নিভিয়ে দিতে পারেনা সর্বব্যাপী ব্যপ্ত হিংসার প্রদীপ্ত লেলিহান শিখা, স্তব্ধ করে দিতে পারেনা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্যত আস্ফালন। কেননা যে কোন ব্যবস্থাই সেই সমাজের নিয়ন্ত্রক শ্রেণির স্বার্থে রচিত হয়। কবির অন্তরে শুধু নেচে যায় বোধের তীব্র ছোবল বক্তি মানুষ থেকে সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার এক মানবিক দংশন। বিচ্ছিন্নতা থেকে এভাবেই বেরিয়ে আসেন কবি। অনুভব করেন সময়ের স্পন্দন, হাত ধরেন মানুষের। তাঁর চিবুকে একটি প্রাচীন রাগ যা তাঁকে ক্রোধী করে তোলে অন্যায় অত্যাচার অসাম্যের বিরুদ্ধে। তিনি নীরবে বুনে যেতে থাকেন গোপন দীর্ঘশ্বাস- তাঁর শব্দশিল্পে, প্রতিবাদী কবিতায়।